Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 199-207
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.098

গুণতত্ত্ব ও নৈতিকতা: সাংখ্য দর্শনের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

মহুয়া চৌধুরী, *গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, দর্শন বিভাগ, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.04.2026; Accepted: 29.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sāṃkhya philosophy is one of the oldest and most influential traditions in Indian philosophical thought. It explains the universe based on two fundamental realities: Prakṛti(Nature) and Puruṣa(Consciousness). In the Sāṃkhyakārikā, composed by Ācārya Īśvarakṛṣṇa—considered the earliest extant foundational text of this system—the three fundamental qualities (guṇas) of Prakṛti are described. These three guṇas are reflected in human character and morality. The theory of guṇas—Sattva, Rajas and Tamas—is a central aspect for the structure and transformation of the material world but also profoundly influence human ethical life, society and welfare-oriented thinking.

Sattva represents knowledge, purity and the foundation of ethical conduct, which are essential for individual self-development and social harmony. Rajas embodies activity, ambition and the force of change; while it acts as the driving force behind creativity and technological progress, if left uncontrolled, it may lead to selfishness and inequality. Tamas signifies ignorance, inertia and lack of discernment, which can result in the degradation of both the individual and society.

This paper presents an analytical discussion on the concept of guṇas and their relation to ethics in sāṃkhya philosophy, drawing upon the Sāṃkhyakārikā and its classical commentary Sāṃkhyatattvakaumudī by Vācaspati Miśra. The study examines the relationship between the theory of guṇas and ethics; and explores how these qualities contribute to the formation of moral values in both individuals and society. It also reflects on the relevance of these ideas in modern life. In other words, this paper discusses ethics, human development and the impact on contemporary society through the lens of the guṇas theory. Based on the above discussion it is emphasized that the theory of guṇas is not merely an abstract philosophical concept, but is highly relevant to modern society, ethical life and the formation of personality.

Keywords: Ethics, Prakṛti, Sattva, Rajas, Tamas, Human Development

ভারতীয় দার্শনিক পরম্পরায় সর্বপ্রাচীন দর্শন হল সাংখ্য দর্শন। সাংখ্যের মূল প্রবক্তা হলেন পরম ঋষি কপিল। সাংখ্য দর্শনের অধুনালভ্য সর্বপ্রাচীন সূত্রগ্রন্থ হল আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত *সাংখ্যকারিকা*। এই দর্শন জগততত্ত্ব ও মুক্তির উপায় ব্যাখ্যায় যুক্তিপূর্ণ ও বিশ্লেষণভিত্তিক অবস্থান গ্রহণ করে। সাংখ্য দর্শন একটি বিশ্লেষণধর্মী ও যৌক্তিক দর্শন হওয়ায় এর আলোচনায় নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। নৈতিকতার ধারণা মূলত সংহত মূল্যবোধ ও আদর্শ চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথা বলে। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে নীতি এমন একটি উপাদান যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে,

জীবনের সুখ-দুঃখের পরিপ্রেক্ষিতে তার কর্মের যথার্থতা নির্ধারণে সাহায্য করে। এই নৈতিক বোধ মানুষকে আত্মপলব্ধির পথে নিয়ে যায় এবং তার চরিত্রে উৎকর্ষ আনে। ভারতীয় দর্শনে নীতিকে কেবল সামাজিক নিয়মরূপে নয়, বরং আত্মিক উন্নয়নের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এজন্যই বলা যায় যে নৈতিকতা ব্যতিরেকে ধর্ম, দর্শন কিংবা আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পারে না।

যা নীতি সম্মত তাই নৈতিক। নীতি শব্দের অর্থ হল যা আমাদের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হতে সহায়ক। মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে নীতির উপস্থিতি অপরিহার্য। ভারতীয় দার্শনিকরা পার্থিব সুখ লাভের আদর্শ থেকে তাঁদের আধ্যাত্মিক আদর্শকে পৃথক করেছেন। যে নীতি মানুষকে সুখ-দুঃখের পরপারে নিয়ে যায়, যা আত্মোপলব্ধির মহিমায় ভাস্বর তাই ভারতীয় দর্শনে শ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত হয়েছে। নীতি মানুষকে শুধু যে সুন্দর চরিত্র লাভের অধিকারী করতে চায় তা নয়, তাঁকে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতেও উদ্বুদ্ধ করে। তাই যেখানেই নীতির কথা আলোচনা হয়েছে সেখানেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শন মূলত তাত্ত্বিক; কাজেই ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা এবং তার প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব? এর উত্তরে বলা যায়, কিছু কিছু ধারণা এমনভাবে দর্শনে বিদ্যমান যে, তাদের বিশ্লেষণ-এর মাধ্যমেই আমরা ভারতীয় নৈতিকতার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে পারি। সেইসাথে কিভাবে তার প্রয়োগ সম্ভব সে বিষয়েও জানতে পারি।

নৈতিকতার ধারণা:

মোক্ষ লাভের উপায় অন্বেষণের লক্ষ্যে সমগ্র ভারতীয় নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়েই পার্থিব জগতের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে আধ্যাত্মিক জগতের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ নৈতিকতাকে আধ্যাত্মিক পটভূমিতে দেখা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে মোক্ষ লাভই জীবের পরমাদর্শ। আমরা সকলেই এবিষয়ে অবগত যে, মানুষের জীবনে সবচেয়ে কষ্টকর অনুভূতি হল দুঃখের অনুভূতি। এই দুঃখানুভূতির জন্যই মানুষ দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজে অর্থাৎ মানুষের মনে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগে। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* গ্রন্থে বলেছেন,

> “এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত যদি দুঃখং নাম জাগতি ন স্যাৎ”।[১]

অর্থাৎ জগতে যদি দুঃখের কোন অস্তিত্ব না থাকত এবং অস্তিত্ব থাকলেও যদি তা ত্যাগের যোগ্য না হত, যোগ্য হলেও যদি তার সম্পূর্ণ-রূপে নাশ সম্ভব না হত, তবে সাংখ্য শাস্ত্র বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগত না। তিনি বলেছেন,

> “তত্র ন তাবদ্দুঃখং নাস্তি নাপ্যজিহাসিতমিত্যুক্তং দুঃখত্রয়াভিঘাতাদিতি”।[২]

অর্থাৎ এই বাক্যের দ্বারা একথা স্পষ্ট যে জগতে দুঃখ নেই এবং দুঃখ পরিত্যাগ করা যায় না—এমন নয়। সাংখ্য দর্শনের অন্যতম সূত্রগ্রন্থ *সাংখ্যকারিকা*-র প্রথম কারিকায় এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থের প্রথম কারিকাটি হল—

> “দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
> দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ।।”

---

[১] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র: *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, পৃ. ৮

[২] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র: *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, পৃ. ১০

সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে সমস্ত জীবকূল ত্রিবিধ দুঃখ-তাপ ভোগ করে। "তৎ খলু আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চ"।[৩] অর্থাৎ ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে এই ত্রিবিধ দুঃখ হল— (ক) আধ্যাত্মিক দুঃখ, (খ) আধিভৌতিক দুঃখ এবং (গ) আধিদৈবিক দুঃখ। *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থটি শুরু হয়েছে জীবের এই ত্রিবিধ দুঃখের অভিভবের তিন প্রকার উপায় দিয়ে। সেগুলি হল— দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়, আনুশ্রবিক উপায় তথা বেদবিদিত যাগযজ্ঞাদি কর্মকলাপ এবং সাংখ্য শাস্ত্র বিহিত উপায়— তত্ত্বজ্ঞান।

সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় তত্ত্ব নামে অভিহিত। আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা*-গ্রন্থে দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকার করেছেন, যথা— প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হয় মোট তেইশ প্রকার তত্ত্ব। ফলে সাংখ্য দর্শনে সর্বমোট পঁচিশ প্রকার তত্ত্ব স্বীকৃত। এই তত্ত্বগুলি দার্শনিক জগতে 'পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব' নামে প্রসিদ্ধ; যথা— পুরুষ বা জ্ঞ, অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি বা প্রধান, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ; পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ আকাশ বা ব্যোম্, মরুৎ বা বায়ু, তেজ বা অগ্নি, অপ্ বা জল, ক্ষিতি বা পৃথিবী। সাংখ্য দর্শনে এই পঁচিশটি তত্ত্বের জ্ঞান তথা ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর ভেদজ্ঞানকেই জীবের সকল দুঃখের চিরনিবৃত্তির উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নৈতিকতা বিষয়টি জগতের সাথে সম্পর্কিত। জগৎ— এর অস্তিত্ব না থাকলে নৈতিকতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত একটি সুনির্দিষ্ট জগৎতত্ত্বের আধারেই নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে। দর্শনের যে শাখায় জগৎতত্ত্ব আলোচিত হয় তা অধিবিদ্যা নামে খ্যাত। সাংখ্য দর্শন হল দ্বৈতবাদী দর্শন। কেননা সাংখ্যমতে জগতের মূল তত্ত্ব হল দুটি। যথা— প্রকৃতি (জড়সত্তা) ও পুরুষ (চিৎ-সত্তা)। সুতরাং সাংখ্য অধিবিদ্যার দুটি চূড়ান্ত মৌলিক উপাদান হল প্রকৃতি এবং পুরুষ। সাংখ্য দর্শনে মূলপ্রকৃতিকে জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ বলা হয়। পুরুষ ছাড়া সব কিছুই মূলপ্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। ব্যক্ততত্ত্ব সহ জাগতিক সব কিছুই মূলপ্রকৃতির সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাক্রমিক পরিণাম। এটিই জগতের প্রথম তত্ত্ব। তাই একে বলা হয় প্রধান। কিন্তু এটি চৈতন্যরহিত বলে একে বলা হয় জড়। এটি তিনটি গুণ দ্বারা গঠিত। এগুলি হল— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সাংখ্য দর্শনানুযায়ী পুরুষ ও প্রকৃতি যখন স্বস্বরূপে অবস্থান করে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে তখন প্রকৃতির জগতাকারে অভিব্যক্তি হয় না। ফলে এই জগত সংসারেরও উদ্ভব হয় না, জীবের অস্তিত্ব থাকে না এবং তার অনিবার্য ফলবশত নীতিবিদ্যার চর্চারও কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে বৈষম্যাবস্থা ঘটে তখন পুরুষের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়ে প্রকৃতি মহত্তাদি রূপে জগতাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ অবিদ্যাবশত প্রকৃতির এই পরিণামকে নিজের বলে মনে করে। তখনই জীবের উদ্ভব হয় এবং এই ব্যবহারিক জগতের সূত্রপাত ঘটে। অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে অবিদ্যা থেকেই জগতের উদ্ভব হয় এবং এই অবিদ্যাকৃত জগতই নীতিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রভূমি রূপে বিবেচ্য হয় আর এইরূপ জগতে বসবাসকারী মানুষের যে পারস্পরিক আচার-আচরণ, ব্যবহার এবং তার বিভিন্ন কর্ম নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

---

[৩] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র: *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, পৃ. ১০

গুণতত্ত্ব:

সাংখ্য দর্শনের গুণতত্ত্ব প্রকৃতির তিনটি মৌলিক গুণের মাধ্যমে জগতের সমস্ত কার্যকলাপ ও নৈতিকতার ভিত্তি ব্যাখ্যা করে। আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর '*সাংখ্যকারিকা*'-গ্রন্থে এই গুণ তিনটি কী কী? এদের লক্ষণই বা কী? এর উত্তরে বলেছেন—

> "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
> অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রয়জনমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।।"[৪]

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সুখ স্বরূপ, রজোগুণ দুঃখ স্বরূপ এবং তমোগুণ মোহ-স্বরূপ। প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং নিয়ম তাদের অর্থ বা প্রয়োজন। পরস্পরকে অভিভূত করা, পরস্পরকে আশ্রয় করা, পরস্পরের সাহায্যে বৃত্তির জনক হওয়া এবং পরস্পরের নিত্যসঙ্গী হওয়া তাদের বৃত্তি। এখন প্রশ্ন হল কোন্ গুণ কীরূপ? কেনই বা এরূপ হয়? এর উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন—

> "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
> গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ।।"[৫]

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হল লঘু, প্রকাশক ও ইষ্ট, রজোগুণ চালক, আরম্ভক ও চঞ্চল এবং তমোগুণ ভারী ও আবরক। প্রয়োজন বা কার্য-সিদ্ধির জন্য প্রদীপের অনুরূপ তাদের বৃত্তি বা কার্য হয়। প্রত্যেকটি পরিণামী বস্তু সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক হওয়ায় ঐ সুখ-দুঃখ-মোহের কারণরূপে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এখন প্রশ্ন হল পরস্পর বিরুদ্ধ এই গুণগুলি কিভাবে মিলিতভাবে কাজ করে? এর উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর '*সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*'-তে বলেছেন প্রদীপের ন্যায় এরা একই প্রয়োজনে অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধনের জন্য কাজ করে থাকে। তিনি বলেছেন সলতে ও তেল যেমন আগুনের বিরোধী হয়েও একসঙ্গে মিলিত হয়ে রূপ প্রকাশের কাজ করে; আবার বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরোধী হলেও একত্রে শরীর ধারণের কাজ করে তেমনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ পরস্পর বিরোধী হলেও একে অপরের অনুবর্তী হয়ে নিজ নিজ কাজ করে।

মানুষের চরিত্র ও আচরণে যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে তা মূলত এই তিনটি গুণের ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। সত্ত্বগুণ জ্ঞান, পবিত্রতা ও শুদ্ধতার প্রতীক; এটি আত্মজ্ঞান, নৈতিকতা ও মুক্তির পথে পরিচালিত করে। রজঃগুণ কর্মোদ্যম, আকাঙ্খা ও উত্তেজনার নির্দেশক; এটি মানবজীবনে গতিশীলতা আনে, তবে অতিরিক্ত রজঃগুণ কামনা ও আসক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। এবং তমঃগুণ অজ্ঞানতা, অলসতা ও নির্লিপ্ততার প্রতীক; এটি মানবজীবনকে অন্ধকার ও অজ্ঞানের দিকে ধাবিত করে। এই তিনটি গুণ পারস্পরিক ক্রিয়ায় মানুষের মানসিক ও নৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করে। একজন ব্যক্তির চরিত্র ও কর্মপ্রবণতা নির্ভর করে এই গুণত্রয়ের ভারসাম্যের উপর।

সাংখ্যকারিকা-গ্রন্থের চতুশ্চত্বারিংশৎ কারিকা-য় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন—

> "ধর্ম্মেণ গমনমূর্ধ্বং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
> জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ।।"

অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের ঊর্ধ্বগমন এবং অধর্মের দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের অধোগমন হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকজ্ঞান অথবা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিবেকজ্ঞান হলে পরম পুরুষার্থ অপবর্গ বা মোক্ষ লাভ হয়

---

[৪] কারিকা-১২, *সাংখ্যকারিকা*

[৫] কারিকা-১৩, *সাংখ্যকারিকা*

এবং বিবেকজ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞানবশত বন্ধন হয়। তাই সাংখ্য দর্শনে ধর্মাচরণ, বৈরাগ্যাভ্যাস ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান-রূপ আত্মসাক্ষাৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে; যা নৈতিকতার সহায়ক।

এখন ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা জানা প্রয়োজন। আলোচ্য কারিকায় ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞানাদিকে নিমিত্ত বলা হয়েছে। বাচস্পতি '*সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*'-তে ঊর্ধ্ব শব্দের দ্বারা দ্যুলোকাদি বা স্বর্গাদিকে বুঝিয়েছেন এবং অধোগমন বলতে সুতলাদিদেশে গমনকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে ধর্মের দ্বারা উৎকৃষ্ট জন্ম হয় এবং অধর্মের দ্বারা অপকৃষ্ট জন্ম হয়। জ্ঞানরূপ নিমিত্তের দ্বারা পুরুষের অপবর্গ হয়। ধর্ম ও বৈরাগ্য অপবর্গের সাক্ষাৎকারণ হয় না, সহকারী হয়। অপবর্গের সাক্ষাৎকারণ জ্ঞান। সাংখ্যসম্মত ঐ অপবর্গজনক জ্ঞানকে বিবেকখ্যাতি বা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি বলা হয়। জ্ঞানের দ্বারা অপবর্গ হয় এবং বিপরীতের দ্বারা বন্ধন হয়। উপরিউক্ত কারিকায় বিপর্য্যয় শব্দের দ্বারা জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। বাচস্পতি বলেছেন— "বিপর্য্যয়াৎ-অতত্ত্বজ্ঞানাৎ"[৬]। এই অতত্ত্বজ্ঞানই বন্ধের হেতু। বন্ধ তিন প্রকার। যথা— (১)প্রাকৃতিক বন্ধ, (২) বৈকৃতিক বন্ধ এবং (৩) দাক্ষিনক বন্ধ।

উপরিউক্ত কারিকায় ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান এই চারটির ফল প্রদর্শন করে পরবর্তী কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন—

> "বৈরাগ্যাৎপ্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাৎ।
> ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াত্তদ্বিপর্য্যাসঃ।।"[৭]

অর্থাৎ এই কারিকায় তিনি বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য-এর ফল প্রদর্শন করেছেন। বৈরাগ্য হল দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা। বৈরাগ্যের ফল হল প্রকৃতিলয়। অবৈরাগ্য হল দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষয়ে রাগ বা আসক্তি। এই রাগ রজোগুণ সম্ভূত এবং বৈরাগ্যের বিপরীত। অবৈরাগ্যের ফলেই সংসার হয়। বাচস্পতির মতে— "রাজসাৎ ইত্যনেন রজসো দুঃখহেতুত্বাৎ সংসারস্য দুঃখহেতুতা সূচিতা"[৮] অর্থাৎ রাগকে রজোগুণ সম্ভূত বা রাজস বলায় এই সংসার দুঃখের হেতু তা সূচিত হয়। কেননা রজগুণ দুঃখের হেতু হয়। ঐশ্বর্য্যের ফল হল অবিঘাত। ঐশ্বর্য্যের ফলে সকল বিষয়ে ইচ্ছা অপ্রতিহত হয়। ঐশ্বর্য্যের বিপরীত অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্যের ফল হল সর্বত্র ইচ্ছার বিঘাত।

ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য এই আটটি ভাব বুদ্ধিতে বা কারণে আশ্রিত। এইগুলি সকল কার্য্যের নিমিত্ত হয়ে থাকে। এই আটটি বুদ্ধির ধর্ম। সাংখ্য শাস্ত্রে এগুলি 'ভাব' শব্দের দ্বারা উল্লিখিত। এই আটটির মধ্যে কয়েকটি মুমুক্ষ ব্যক্তির উপাদেয় এবং কয়েকটি হেয়। ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য এই অষ্টবিধ বুদ্ধিধর্মের মধ্যে কোনটি মুমুক্ষের হেয় এবং কোনটি উপাদেয় তা বোঝাবার জন্য সাংখ্য দর্শনে বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি-র স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। '*সাংখ্যকারিকা*'-য় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এগুলি বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তা বুদ্ধির কার্য বা বুদ্ধিসর্গ বা প্রত্যয়সর্গ নামে খ্যাত। বিপর্যয় বলতে ভ্রম বা সংশয় জনিত মিথ্যাজ্ঞানকে বোঝায়। ইন্দ্রিয় বিকল হলে বুদ্ধির অশক্তি ঘটে। তুষ্টি হল কোন বিষয়ে জানতে অনিচ্ছা হলে 'এর দ্বারা কী প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হবে' এরূপ প্রসন্নতা। সিদ্ধি হল কোন বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান। বিপর্যয়ে অজ্ঞান থাকে।

---

[৬] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র: *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, পৃ. ২৮৮

[৭] কারিকা-৪৫, *সাংখ্যকারিকা*

[৮] গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র: *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, পৃ. ২৮৯

অশক্তিতে অধর্ম ও অনৈশ্বর্য থাকে। তুষ্টিতে থাকে ধর্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এবং সিদ্ধিতে থাকে জ্ঞান। ত্রিগুণের বৈষম্যের জন্য পরস্পরের অভিভববশত এই চারটি প্রত্যয়সর্গ বা বুদ্ধিসর্গের পঞ্চাশ প্রকার ভেদ হয়ে থাকে। বাচস্পতি '*সাংখ্যকারিকা*' গ্রন্থের উপর রচিত তাঁর '*সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*' নামক টীকাগ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন এই প্রত্যয়সর্গ বা বুদ্ধিসর্গের মধ্যে বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটি সিদ্ধির নিবারক হওয়ায় তা হেয় রূপে পরিগণিত হয় এবং অধ্যয়ন, শব্দ, ঊহ, সুহৃৎপ্রাপ্তি, দান ও ত্রিবিধ দুঃখ বিঘাত এই অষ্টবিধ সিদ্ধি উপাদেয় রূপে পরিগণিত হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য এই আটটি ভাব বুদ্ধিতে বা কারণে আশ্রিত। প্রকৃতি থেকে প্রথম উৎপন্ন তত্ত্ব বুদ্ধি বা মহৎও প্রকৃতির ন্যায় ত্রিগুনাত্মক। প্রকৃতির যেমন পরিণাম হয় তেমনি বুদ্ধিরও পরিণাম হয়। এখন প্রশ্ন হল কোন গুণের উৎকর্ষ হলে বুদ্ধির কিরূপ পরিণাম হয়। বুদ্ধির যে সকল পরিণাম বা ধর্ম বিবেকজ্ঞানের উপযোগী হয় সেই ধর্মগুলি কী কী? ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন—

> "অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্যম্।
> সাত্ত্বিকমএতৎদ্রূপং তামসমঅস্মাৎবিপর্যস্তম্।।"[৯]

অর্থাৎ অধ্যবসায় তথা অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হল বুদ্ধি। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ এবং এই ধর্মাদির বিপরীত অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যরূপ চারটি অসদ্‌গুণ বুদ্ধির তামস রূপ। সাত্ত্বিক ধর্মের উপাদান সত্ত্বগুণ এবং তামস ধর্মের উপাদান তমোগুণ। রজোগুণ ঐ সকল ধর্মের উপাদানকারণ না হলেও নিমিত্তকারণ হয়। সাত্ত্বিক ধর্ম হল ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। এই সকল সাত্ত্বিক ধর্মের বিপরীত হল তামস ধর্ম। অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য তামস ধর্ম। যখন বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং রজোগুণ ও তমোগুণ বশীভূত বা অভিভূত হয় তখন ঐ সত্ত্বগুণের পরিণাম হওয়ায় ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ ধর্ম চতুষ্টয় আবির্ভূত হয়। যখন তমোগুণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ বশীভূত বা অভিভূত হয় তখন ঐ তমোগুণের পরিণাম হওয়ায় অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যরূপ ধর্মচতুষ্টয় আবির্ভূত হয়। এই ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-কেই বিবেকজ্ঞানের উপযোগী বলা হয়েছে। যা বুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ।

গুণতত্ত্ব ও নৈতিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক:

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সাংখ্য দর্শন অনুসারে নৈতিক জীবনযাত্রার মূল ভিত্তি হল গুণত্রয়ের সঠিক সমন্বয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই তিনটি গুণ বিদ্যমান, তবে যার মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল তিনি নৈতিকভাবে উন্নত ও আত্মজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে রজঃগুণ বেশি হলে ব্যক্তি অতিরিক্ত আকাঙ্খার শিকার হন এবং তমঃগুণের আধিক্য থাকলে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয়, অলস ও অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হন। নৈতিক উৎকর্ষের জন্য সাংখ্য দর্শন সত্ত্বগুণের বিকাশ ও রজঃ-তমঃগুণের নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দেয়। এর দ্বারা ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে, আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং মুক্তির পথে ধাবিত হয়।

সাংখ্য মতে সত্ত্বগুণ জ্ঞান ও বিশুদ্ধতার গুণ; যা প্রবল হলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং মুক্তির দিকে ধাবিত হয়। রজঃগুণ হল চঞ্চলতা ও কর্মশীলতার গুণ; যা জীবকে কর্মে নিয়োজিত রাখে এবং পুনর্জন্ম চক্রে আবদ্ধ রাখে। এবং তমঃগুণ হল জড়তা ও অজ্ঞানের গুণ; যা অবিদ্যা বৃদ্ধি করে এবং মোহ সৃষ্টি করে, যার ফলে

---

[৯] কারিকা-২৩, *সাংখ্যকারিকা*

মুক্তি বিলম্বিত হয়। সাংখ্য দর্শনে তাই বলা হয়েছে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর তখনই ঊর্ধ্ব গমন করতে পারে যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় এবং রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাব কমে আসে। অর্থাৎ সাংখ্য মতে জ্ঞান, বৈরাগ্য এসবের মাধ্যমেই সূক্ষ্ম শরীর উন্নত হয় এবং চিত্তের মুক্তির পথ সুগম হয়।

একজন মানুষের আত্মিক উন্নতি তখনই সম্ভব যখন তিনি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেন, রজঃগুণকে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তমঃগুণ পরিহার করেন। সাংখ্য দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল কৈবল্য অর্থাৎ প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম জ্ঞানে উপনীত হওয়া; যা কেবলমাত্র সত্ত্বগুণের চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব। অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা, আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে। ‘*সাংখ্যকারিকা*-তে বর্ণিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে মানবজীবন মূলত গুণত্রয়ের ক্রিয়াশীলতার ফল এবং এটি পরিণামে ব্যক্তির নৈতিক অবস্থান ও আচরণ নির্ধারণ করে। অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনের গুণতত্ত্ব কেবল বিশ্বজগতের গঠন ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করে না, এটি নৈতিক জীবনযাত্রারও দিক নির্দেশনা প্রদান করে। সুতরাং গুণতত্ত্ব কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, এটি মানুষের নৈতিকতার নির্ধারক এবং আত্মশুদ্ধির পথপ্রদর্শকও বটে।

আধুনিক জীবনে প্রাসঙ্গিকতা:

সাংখ্য দর্শনের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিষয় নয়, এটি আধুনিক সমাজ ও ব্যক্তিজীবনেও কার্যকরভাবে প্রয়োগযোগ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের বিকাশ ঘটিয়ে নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির বোধ জাগ্রত করা সম্ভব। রজঃ ও তমঃগুণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি অর্থাৎ উদ্বেগ ও হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সত্যবাদিতা, সংযম ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সত্ত্বগুণের বিকাশ ঘটানো; আইন ও নৈতিক নীতির ভিত্তিতে রজঃগুণকে সুশৃঙ্খল রাখা এবং প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার ও সংযমী মনোভাব বজায় রেখে অনৈতিক আসক্তি থেকে দূরে থাকা সম্ভব। সত্ত্বগুণ প্রাধান্য পেলে ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধ, সত্যবাদিতা ও জ্ঞানের পথে চালিত হবে। রজঃগুণ অধিক থাকলে ব্যক্তির কর্মচঞ্চলতা থাকবে, তবে তা অতিরিক্ত হলে লোভ ও স্বার্থপরতায় পর্যবসিত হবে। তমঃগুণ অধিক থাকলে ব্যক্তি অলসতা, অজ্ঞতা এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে চালিত হবে। কাজেই সমাজ যদি সত্ত্বগুণের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয় তবে তা জ্ঞানভিত্তিক, ন্যায়পরায়ণ এবং কল্যাণমুখী হবে; রজঃগুণ প্রভাবিত সমাজে প্রতিযোগিতা, উদ্ভাবন বেশি থাকলেও এটি লোভ ও বৈষম্য বৃদ্ধি করতে পারে এবং তমঃগুণের আধিপত্য থাকলে সমাজে অরাজকতা, অপরাধ ও অবক্ষয় দেখা দেবে।

আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সাংখ্য দর্শনের গুণতত্ত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান যুগে মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত গতিশীল, প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রযুক্তিনির্ভর। এই প্রেক্ষিতে মানুষের মানসিক ভারসাম্য, নৈতিকতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। এই সমস্যার সমাধানে সাংখ্য দর্শনের গুণতত্ত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দিশা প্রদান করে।

বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে রজঃগুণের আধিক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অতিরিক্ত কর্মচাঞ্চল্য, ভোগবিলাস, প্রতিযোগিতা এবং সাফল্যের প্রতি অতি আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনকে এক অস্থির অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর ফলে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, হিংসা এবং অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার অন্যদিকে তমঃগুণের প্রভাবও সমানভাবে লক্ষণীয়। প্রযুক্তির অপব্যবহার, অলসতা, দায়িত্ববোধের অভাব এবং নৈতিক অবক্ষয় তমঃগুণের বহিঃপ্রকাশ। এই দুই গুণের অপ্রতিহত প্রভাব মানুষের জীবনকে ভারসাম্যহীন করে তুলছে।

এই পরিস্থিতিতে সত্ত্বগুণের বিকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সত্ত্বগুণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান, সংযম, সহানুভূতি, সত্যবাদিতা এবং নৈতিকতার বোধ জাগ্রত করে। শিক্ষার মাধ্যমে, নৈতিক মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে সত্ত্বগুণকে বিকশিত করা সম্ভব। বিশেষত বর্তমান প্রজন্মের ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষার অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা; এই ক্ষেত্রে সাংখ্য দর্শনের গুণতত্ত্ব একটি কার্যকর দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও গুণতত্ত্বের প্রয়োগ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আধুনিক যুগে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং মানসিক অস্থিরতা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্ত্বগুণের বিকাশের মাধ্যমে মনকে শান্ত, স্থির এবং সুস্থ রাখা সম্ভব। যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় এবং রজঃ ও তমঃগুণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে ব্যক্তি মানসিকভাবে সুস্থ ও স্থিতিশীল জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়।

সামাজিক ক্ষেত্রেও গুণতত্ত্বের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সমাজ তখনই উন্নত হতে পারে যখন তার সদস্যরা নৈতিক, দায়িত্বশীল এবং সচেতন হয়। সত্ত্বগুণ প্রাধান্যপ্রাপ্ত সমাজে ন্যায়, সমতা এবং সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রজঃগুণ নিয়ন্ত্রিত থাকলে তা উন্নয়ন ও সৃজনশীলতার সহায়ক হয় এবং তমঃগুণ পরিহার করা গেলে সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়। অতএব, একটি সুস্থ ও কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের জন্য গুণত্রয়ের সঠিক সমন্বয় অপরিহার্য।

উপসংহার:

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সাংখ্য দর্শনের গুণতত্ত্ব মানব উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি সত্ত্বগুণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, রজঃগুণকে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং তমঃগুণকে পরিহার করা হয় তবে ব্যক্তি, সমাজ ও মানবসভ্যতার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। ব্যক্তি যদি সত্ত্বগুণের বিকাশ ঘটিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হন, তবে তিনি কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি অর্জন করবেন না, বরং সমাজের কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভাবঘনানন্দ, স্বামী (২০০০)। সাংখ্যকারিকা। উদ্বোধন কার্যালয়। কলকাতা।
২. দিবাকরানন্দ, স্বামী (১৯৭৬)। শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীতা সাংখ্যকারিকা। প্রকাশক—গণেশ চন্দ্র দত্ত, ৩৪, সদানন্দ রোড। কলকাতা।
৩. বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য, পূর্ণচন্দ্র (১৯৮৩)। সাংখ্যকারিকা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। কলকাতা।
৪. ন্যায়াচার্য্য, হরিরামশুক্ল (১৯৩৭)। শ্রী ঈশ্বরকৃষ্ণবিরচিতা সাংখ্যকারিকা ষড়দর্শন-টীকাকৃদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী সহিতা। কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ-পুস্তক-মালা, ১২৩। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ। বেনারস।
৫. গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র (১৯৯৪)। শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। কলকাতা।
৬. ভট্টাচার্য্য, রজত (২০১১)। সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। (প্রথম খণ্ড)। প্রগতিশীল প্রকাশক। কলকাতা।
৭. ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ (সপ্ততীর্থ) (১৯৮৪)। সাংখ্য দর্শনের বিবরণ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। কলকাতা।
৮. ঘটক, পঞ্চানন (২০০০)। সাংখ্য দর্শন। (প্রথম অংশ)। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা।
৯. ঘটক, পঞ্চানন (২০০৯)। সাংখ্য দর্শন। (দ্বিতীয় অংশ)। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা।
১০. Chakravarti, Pulinbihari (1975). Origin and Development of the Sāṁkhya System of Thought, 2nd edn. Oriental Books Reprint Corporation. New Delhi.